International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-I, Issue-IV, January 2015, Page No. 26-29
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

রবীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চা : একটি সংক্ষিপ্ত আখ্যান

গৌতম কর
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

To most of us Rabindranath Tagore is familiar as a renouned poet, author, dramatist and singer. But it must be remembered that he has achieved a remarkable place in the realm of drawing too. It is quite interesting to note that at an age of sixty five he started drawing pictures for the first time. In 1925 during the editing of the manuscript of famous "Purabi" he, quite unconsciously marked his pen on the pages which even to the surprise of the great poet took shapes of different pictures. This gave birth to 'World of meaning' and 'World of gesture'. Abanindranath Tagore, while recalling Rabindranath's appearence as an artist compared it with a 'volcanic impulse'. Again, artist Binodbehari Mukhopadhyay claimed that those drawings have a significant role in understanding the very literature and introspection of Tagores mind in the last two decades of his life. In short, this 'artist' Tagore led the 'poet' Tagore to a new world of thought. It may be claimed that in his last days from 'Raktakarabi' (1925) to 'Seshlekha' (1941) his thought, view and language were guided by this "world of gesture". So, it may be argued that Rabindranath's drawings are indispensably attached to his World of multifaceted and illustrious creations. Actually this phase of his life was nothing but the concluding part of his whole-life of creation. This article is therefore an attempt to explore Rabindranath as an artist.

বিংশ শতাব্দীর দার্শনিক মিশেল ফুকো বলতেন - 'Knowledge is Power' - এখানেও সেই সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠা। প্রকৃতির রাজ্যে যে বিশাল প্রাণীজগৎ, মানুষ তাদের মধ্যে উৎকৃষ্টতম। মানুষই একমাত্র প্রজাতি যে শুধুমাত্র প্রকৃতির নিয়ম-কানুনের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং সে এই নিয়মগুলো অমোঘ জেনেও অমান্য করে, প্রকৃতিকে চ্যালেঞ্জ জানায়। মানুষ নিত্য নতুন নিয়ম সৃষ্টি করে। সভ্যতা এগিয়ে চলে, থমকে দাঁড়ায় না। এইসব ঘটনার মূলে যে স্বতোৎসার, তার নাম 'সৃজনশীলতা' - আর তার অন্যতম নিদর্শন রবীন্দ্রনাথ। পরিণত মন, বিচিত্র সৃষ্টির অভিজ্ঞতা, গভীরজীবন উপলব্ধি, উন্নত রুচিবোধ, ছন্দবোধ, রসবোধ ও পরিণতবোধ, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রেনেসাঁর সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব। যাঁর সামগ্রিক চিন্তাচেতনায় ছিল এক অখন্ড বিশ্ববোধ। আমরা অধিকাংশ মানুষই রবীন্দ্রনাথকে জানি কবি, লেখক, নাট্যকার আর সংগীতজ্ঞ হিসেবে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের মাঝেও রিনি একটা স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন অনায়াসেই। আসলে রবীন্দ্রনাথ যখন ছবি আঁকতে শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স পঁয়ষট্টী বছর পেরিয়ে গেছে। ততদিনে কবি-দার্শনিক হিসেবেই তাঁর পরিচয় সকল মানুষের মনে গেঁথে গেছে। আবার ১৯১৩ তে নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্তি সমগ্র বর্হিবিশ্বে তাঁকে কবি বলে সম্মানিত করেছে। সমগ্র দেশবাসীও গর্ব ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে 'কবিগুরু' বলে বরণ করে নিয়েছে।

১৯২৫ সাল, 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের পাতায় পাতায় পান্ডুলিপি সংস্কার আর নিজের মনে খুশি মতো কলম চালনার মধ্য থেকেই ভেসে উঠতে লাগল নানা রূপ।অনেকটা যেন ছবির আকার। প্রৌঢ় বয়সে নিজের কীর্তিখানা দেখে কবি নিজেই তখন বিস্মিত হতবাক। 'পূরবী'র পান্ডুলিপি সংশোধনের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল 'World of meaning', 'World of gesture'।[১] কবি রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকিয়ে রবীন্দ্রনাথ রূপে আত্মপ্রকাশকে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'Volcanic impulse' যেন ঘুমিয়ে থাকা আগ্নেয়গিরির লাভার উদ্‌গীরণ্‌। আর শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন - 'রবীন্দ্রনাথের শেষ কুড়ি বছরের সাহিত্য ও তাঁর মনের গতি বোঝবার জন্য এই ছবিগুলোর বিশেষ মূল্য আছে।[২] কবি রবীন্দ্রনাথকে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ নিয়ে গেছেন এক নতুন পথে। তাঁর শেষের দিকের অন্যতম নাটক 'রক্তকরবী' (১৯২৫) থেকে শুরু করে 'শেষলেখা' (১৯৪১) পর্যন্ত ভাব ও ভাষা এই 'World of gesture' কেই অনুসরণ করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের ছবি তাঁর সমগ্র সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। স্বভাবতই তাঁর সমগ্র মনন-প্রক্রিয়ার সঙ্গেও।

প্রথমেই উল্লেখ করেছি ছবি আঁকতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছিলেন এক আকারের জগৎ 'World of gesture'। ১৯২৮ সালে (১৩ অগ্রহায়ণ) রবীন্দ্রনাথ লিখছেন নির্মলকুমারী মহলানবীশকে, -- 'এর আগে আমার মন আকাশে কান পেতেছিল, বাতাস থকে সুর আসত, কথা শুনতে পেত, আজকাল সে আছে চোখ মেলে রূপের রাজ্যে, রেখার ভিড়ের মধ্যে। গাছপালার দিকে তাকাই, তাদের দেখতে পাই - স্পষ্টবুঝি জগৎটা আকারের মহাযাত্রা। ... আবেগ নয়, ভাব নয়, চিন্তা নয়,

রূপের সমাবেশ।'[৩] রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার প্রক্রিয়াটা ছিল ঠিক কবিতা লেখার বিপরীত। কবিতায় যেমন বিষয় আসে আগে, তারপর আসে রূপ। কিন্তু ছবি আঁকার সময় আকার বা রূপের প্রক্রিয়া শুরু হয় আগেই। এখানে রূপই নিয়ন্ত্রণ করে ভাবকে। "রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় কলমের মুখে।"[৪] তারপর সেই বিন্যাসের মধ্য দিয়ে জেগে ওঠে রূপ। সেই রূপের সূত্র ধরেই পৌঁছানো যায় বিষয় বা ভাবে। আসলে আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টিকার্যে বারবার নিজেকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন, তাঁর সৃষ্টিকর্ম বারবার বাঁক ফিরেছে। সামগ্রিকভাবে দেখলে তাঁর ছবিও এরকম একটা বড়ো বাঁক ফেরা।

রবীন্দ্রচিত্রকলা এক আশ্চর্য, তুলনাহীন এবং অপ্রত্যাশিত আঙ্গিকের মধ্যে দিয়ে এসেছে। প্রথম প্রথম নিজের পাণ্ডুলিপির ভুল সংশোধনের সময় কলম চালিয়ে তিনি কাটাকুটি অংশগুলো ঢেকে ফেলতেন। পাণ্ডুলিপির এই কাটাকুটি অংশগুলি কখন যেন বিশেষ এক ছন্দময় আকার ধারণ করত। আসলে এক পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্যবোধ কবির আজন্মলালিত। তাই লেখার মধ্যে কাটাকুটি কুশ্রীতা তিনি সহ্য করবেন এমনটা আশা করা যায় না। ফলে বর্জিত অংশগুলি এমনভাবে রেখার জালে ঢেকে দিলেন যার থেকেই বেরিয়ে এল এক একটা ফর্ম, জ্যামিতিক আকার। কখনো অদ্ভুত পশু-পাখির মুখ, দেহ, উড়াল দেওয়া পাখির ডানা, ধারলো ধাতব চঞ্চু, শিকারি চোখ, প্রাচিন প্রাগৈতিহাসিক জন্তু জানোয়ারের স্থুল বিপুল অবয়ব। মানব মানবীর মুখাবয়ব ফুটে উঠল কলমের নিবের আঁচড়ে। শিল্পীর হাতে তৈরী হল মন্দিরতোরণের জাফরির কারুকলা। ক্রমশ গাছপালা নিসর্গের ছবিও আঁকলেন দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে, সাহসী তুলি কিংবা কলম চালনায়। অনেকটাই খেলাচ্ছলে হিজিবিজি ইচ্ছেমতো খেয়ালখুশির তুলির দাগে সূক্ষ ধারালো কলমের নিবের খোঁচায় মূর্ত হয়ে উঠল বিচিত্র সব আয়তন। আর এ বিষয়ে প্রচলিত কোন নিয়ম রীতিকে মোটেই তিনি মানলেন না। আসলে তাঁর শিক্ষা কখনোই কোন বন্ধনকে স্বীকার করেনি। আর ছবির রাজ্যেও তিনি একান্তই স্বাধীন। পরোয়া করলেন না বেঁধে দেওয়া ছবির সংজ্ঞা বা ব্যাকরণকে। চালু প্রথাকে নস্যাৎ করে খুশির জোয়ারে ভাসলেন।

রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' নাটক রচনা করেন ১৩৩০ সালে, যখন গ্রীষ্মের ছুটি উপভোগ করছিলেন শিলঙে। এই শিলঙ পাহাড়েই ক্যাপিটেলিস্টদের পরিচালিত ফ্যাক্টরীতে শ্রমিকজীবনের দুর্দশার কথা জানলেন রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের কাছে। অনুভব করলেন এক গভীর অস্থিরতা। এই নাটকেরই একটি গান "আমার শেষ রাগিনীর প্রথম ধুয়ো ধরলি রে, কে তুই?" – এই গানটিকে ঘিরেই কলমের আঁচড়ে কাটাকুটির মধ্য দিয়ে গড়ে উঠল একটা ছবি। সাদা-কালোর তীব্রতায় এক যন্ত্রণাক্ত পশুর আর্তি গড়ে উঠেছে যেন রেখার আঁচড়ে। আধুনিকতার অন্তর্নিহিত সংঘাত চিত্র রূপ পেল। এ যেন প্রস্রবনের মুক্তধারা, প্রায় পঁয়ষট্রি বছরের উপান্তে পৌঁছেও দেখতে দেখতে তাঁর অনতিপরিসর চিত্রকর জীবনে তিনি প্রায় দুহাজার ছবি এঁকে ফেললেন। ১৯৩০-এ তিনি তাঁর দু-তিন বছরের আঁকা ছবিগুলিকে নিয়ে ইউরোপ-আমেরিকা সফরে বের হন। লন্ডন, বার্মিংহাম, প্যারিস, বার্লিন, ড্রেসডেন, মিউনিক, কোপেনহেগেন, মস্কো, বস্টন আর নিউইয়র্কে তাঁর চিত্রকলার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। তিনি প্যারিস থেকে পুত্রবধূকে লিখলেন, "ছবি আমি কোনো দিন আঁকি নি, আঁকব বলে স্বপ্নেও বিশ্বাস করিনি। হঠাৎ বছর দুই তিনের মধ্যে হু হু করে এঁকে ফেললুম আর ওস্তাদরা বাহবা দিলে। বিক্রিও যে হবে তাতে সন্দেহ নেই। এর মানে কি? জীবনগ্রন্থের সব অধ্যায় যখন শেষ হয়ে এল তখন অভূতপূর্ব উপায়ে আমার জীবনদেবতা এর পরিশিষ্ট রচনার উপকরণ জুগিয়ে দিলেন।"[৫]

রবীন্দ্রনাথের ছবিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের ছবিকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন ১. রেখামূলক অলঙ্করণ, ২. গড়নযুক্ত অলঙ্করণ, ৩. গড়নের ক্ষেত্রে বস্তু-সাদৃশ্যের আবির্ভাব এবং ৪. সাদৃশ্যের প্রাধান্য।[৬] শিল্পী রতন পরিমু রবীন্দ্রনাথের ছবিকে ভাগ করেছেন কালানুক্রমে তাঁর মতে ছবির প্রথম পর্যায় ১৯২৪ থেকে ১৯৩২, -- এই সময়ে পাণ্ডুলিপির বর্জিত অংশগুলিকে ছন্দময় রেখার জালে ঢেকে পংক্তি বা শব্দসজ্জাকে আলাদা করে রেখামূলক অলঙ্করণে প্রয়াসী হয়ে উঠেছেন রবীন্দ্রনাথ। দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৩০ এর পর থেকে ১৯৩৫-এর আগে পর্যন্ত। এই সময়ে তাঁর ছবির বিকাশ যে ভাবে হল, তা যেমন অভূতপুর্ব, তেমনি তাতে যে সকল বৈচিত্র্য দেখা গেল তা সাধারণ কল্পনার বাইরে। সাদা-কালো রেখার গড়ন ছাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ পৌঁছোলেন রঙের ছবিতে। আকৃতি বা প্রকৃতি যা ছিল শুধুই রেখা, যেখানে কোন প্রাণ ছিল না, -- তাই এতদিন পর পেল সপ্রাণ এক তেজের গতিরূপ। আর তৃতীয় বা শেষ পর্যায় ১৯৩৫ থেকে ১৯৪১-এ তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত। এ সময়েই তাঁর ছবিতে দেখা দিল সাদৃশ্যের আভাস। ছবি হয়ে উঠল বর্ণনাত্মক। অলংকার আর বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে ছবি পেল পরিপূর্ণতা। দেখতে পেলাম বস্তু, জীবজন্তু, গাছপালা বা মানুষের বিভিন্ন রূপের ছবি। তাঁরই কথার সূত্র ধরে বলতে পারি –

> "টুকরো যত রূপের রেখা সঞ্চিত রয় মনের চিত্রশালে।
> কখন ছবির আকার নিয়ে জোড়া লাগায় শিল্পকলার জালে।"[৭]

১৯৩০-এর মে মাসে প্যারিসের গ্যালারি পিগেল-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের দু-তিন বছরের আঁকা ছবির একক প্রদর্শনী। পরে লন্ডন, বার্মিংহাম, বার্লিন, ড্রেসডেন, মিউওনিক প্রভৃতি আরো বারোটি শহরে ছবিগুলির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। চিত্রী রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজয় ঘটেছিল এই প্রথম চিত্র সম্ভারের মধ্য দিয়ে। পাশ্চাত্যের দর্শকরা তাঁর ছবি নিয়ে কি বললেন? অঁরি বিদুঁর আলোচনা থেকে এর কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। বিদুঁ বলেছিলেন – 'একটি গোপন প্রতিভা নিদ্রিত ছিল – পরিকল্পনার নিশ্চিত দক্ষতা, tone-এর সৌন্দর্য, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের সজীবতা, মন্ডলের জ্ঞান – সব এ কথাই প্রমাণ করে। মনের চেতনা স্তরের শক্তিগুলির অস্বাভাবিক স্ফুরণে এই গোপন শক্তিটি প্রকাশিত হতে পারেনি, তাই সারাজীবন এই প্রতিভাটি ছায়াচ্ছন্ন থেকে গেছে। ... একটি স্বয়ংক্রিয় বিবর্তনের ফলেই হোক কিংবা পরিচিত পৃথিবীর অস্পষ্টস্মৃতির জন্যই হোক, শিল্পকর্মটি ধীরে ধীরে কোনো পরিচিত প্রাকৃতিক বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্য গড়ে তুলতে থাকে। ... এই চিত্রগুলিকে তাদের গাণিতিক উপাদানে বিশ্লেষণ করলে দৃঢ়তা ও সত্যতার পরিচয় মেলে। অন্যসময় তাদের এমন এক করুণ প্রাণময়তা থাকে যা মনকে স্পর্শ করে।"[৮]

প্রথমদিকে এ দেশে রবীন্দ্রনাথের ছবি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়নি। অনেকেই মনে করেছিলেন ছবিগুলি কবির সাময়িক খেয়ালের প্রকাশ। কিন্তু অনতিকাল পরেই বোঝা গেল রবীন্দ্রনাথের ছবির আলাদা একটা তাৎপর্য রয়েছে। অবশ্য এ বিষয়ে দেশবাসী সম্পর্কে একটা গভীর আক্ষেপও প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। মৈত্রেয়ীদেবীকে দেওয়া চিঠিতে তিনি জানান – "আমার ছবি এ দেশকে দেখাইনি। এখানে অধিকাংশ লোকই ছবি দেখতে জানে না, প্রথমেই দেখে এর চেহারাটা ভালো দেখতে কিনা। দেখতে হয় এটা ছবি হয়েছে কিনা, সে দেখা এমন করে দেখা তা বুঝিয়ে দেওয়া যায়না। একটা নিয়ত অভ্যাস আর instinctive দৃষ্টি থাকা চাই, ছবি দেখা সকলের কাজ নয়। সেই জন্যই আমি এখানে ছবি প্রকাশ করতে চাইনে, প্যারিসে ওরা দেখেছিল আমার ছবি, দেখার মতো করে। আমার ছবি এ দেশের জন্যে নয়।"[৯] প্যারিস থেকে লেখা সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে দেওয়া চিঠির মধ্যেও এই আক্ষেপের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। আসলে দেশবাসীর একদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তীব্র আনুগত্য, অন্যদিকে একদল মানুষের ঈর্ষা জনিত তীব্র সমালোচনা তাঁকে দ্বিধাপন্ন করে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথের ঈষৎ উষ্মা তাই অকারণ নয়। আসলে সেই সময় গ্রহণ বর্জন মেশানো একটা প্রেক্ষাপট লক্ষ্য করি এবং সেটাই খুব স্বাভাবিক।

তবে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর ছবি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন – "আমার আঁকা ছবির অর্থ কী লোকে প্রায়ই আমায় জিজ্ঞাসা করে। আমার ছবিও যেমন নীরব, আমিও তাই, ব্যক্ত করাই তো ওদের কাজ, ব্যাখ্যা করা নয়। অভিব্যক্ত রূপের পিছনে কী আছে যে চিন্তা দিয়ে খুঁজতে হবে, ভাষা দিয়ে বলতে হবে। রূপের সার্থকতা যদি রূপে ফুটে উঠে থাকে তবেই তো ওরা রইল; না হলে বিজ্ঞানের কোনো অর্থ বা সত্য নিহিত, নৈতিক কোনো যুক্তিযুক্ততা, এরূপ কোনো কারণেই ওরা স্থায়ী হবার নয়। [১০]

রবীন্দ্রনাথের ছবির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হল রেখার খেলা আর লালিত। বস্তুত তাঁর ছবি অর্মূতপ্রধান। তাঁর ছবিতে আদমতা ও জার্মান এক্সপ্রেশনিজনের অনুরণন আছে।

অনেকে এ কথার মানে করেন যে, তাঁর ছবির সঙ্গে আদিম মানুষের গুহাচিত্রের তুলনা করা হচ্ছে। কিন্তু 'গুরুদেবের আঁকা ছবি' প্রবন্ধে নন্দলাল বসু বলেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথের ছবির অপরিষ্কৃত ভাব এবং ভাবের ঐশ্বর্যের কারণ সম্ভবত কখনো কখনো তার মধ্যে আদিম গুহাচিত্রের একটা মিল পাওয়া যায়। ... তার মধ্যে শিল্পীর পরিপূর্ণ জীবন, জীবন-সংস্কৃতি সুরুচি এবং বুদ্ধি প্রকাশিত, জীবনদর্শন প্রদর্শিত। কোনো কোনো সমালোচক রবীন্দ্রনাথের ছবির আঙ্গিক বিচারে প্রিমিটিভিজম ও এক্সপ্রেশনিজমের ভূমিকাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। আসলে জার্মানিতে ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ অনেক Expressionist শিল্পীদের কাজ শুধু দেখেননি, যথাযথভাবে তা উপলব্ধি এবং প্রশংসা করেছিলেন। তারই একটা প্রভাব হয়তো ছবিতে লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে আরো একটা বলার বিষয় যে, রবীন্দ্রনাথের অনেক ছবিতেই একটা আবছা বিশাদের ভাব ফুটে উঠেছে। সেটা তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা বিয়োগান্ত ঘটনা যা তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে হয়তো তাই ছবির বিষাদের মেজাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

একদিকে দৃশ্যমান জগতের প্রায় সবকিছুই যেমন পশুপাখি, গাছপালা, পাহাড় পর্বত, নদীনালা, আর অন্যদিকে নির্জীব কিছু আকার নিয়েই সমগ্র রবীন্দ্র চিত্রমালা। স্টীল লাইফ (Still life) ছবির সংখ্যা কম হলেও তাঁর উৎকৃষ্ণ কাজের মধ্যেই গণ্য করা হয়। ফুলের ছবি তিনি বেশি আঁকেননি, কিন্তু যে-কটি এঁকেছেন তা তাঁর পরিশীলিত রুচি, নক্সার ওপর দখল, স্পেসের ব্যবহার এবং রঙের মিতব্যয়িতার পরিচায়ক। আরো একটি বলার মতন বিষয় হল তাঁর ছবিতে নানারকম টেক্সচারের ব্যবহার ছবির সার্বিক প্রকাশভঙ্গিকে যথাযথ মাত্রাদান করেছে। টেক্সচার তিনি কখনও তৈরী করেছেন কলমের আঁচড়ে, কখনো তুলি চালনার স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্য দিয়ে আপনা আপনিই তৈরী হয়েছে এক ধরনের Natural textural pattern, কিংবা ছবির জমির ওপর ন্যাকড়া, তুলো কিংবা নরম অন্য কিছু জিনিস দিয়ে এমনভাবে ঘষামাজা করেছেন যাতে করে আকস্মিকভাবে এখানে_ওখানে টেক্সচার ফুটে উঠেছে। ফলে একতা ছবির জমি হয়ে ওঠেছে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ এবং তা দেখে অনেক পেশাদারী শিল্পীই হয়তো বিস্ময় প্রকাশ করবেন।

রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ রঙের পূজারি ছিলেন না। বিশুদ্ধ লাল, নীল, হলদে তাঁর ছবিতে খুব কমই দেখা যায়। একমাত্র যে রঙটি বিশুদ্ধতার কাছাকাছি এসেছে সেটি হলুদ অথবা কমলারঙ এবং বেশীরভাব ক্ষেত্রে তা হয়েছে পড়ন্ত আলোর আকাশ আঁকবার বেলায়, দিনান্তের বিষাদের মেজাজ ফুটিয়ে তুলতে এ রঙ দুটি খুবই সাহায্য করেছে তা বলাই বাহুল্য। রঙ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর কয়েকটি বিশেষ ঝোঁক লক্ষণীয়। (ক) কালো রঙের ওপর পক্ষপাতিত্ব; (খ) মিশ্রিত রঙ ব্যবহারের প্রবণতা; (গ) যতদূর সম্ভব স্বচ্ছ রঙের পোঁচ কিংবা প্রলেপের প্রতি ঝোঁক; (ঘ) প্রায়শই প্রতিটি রঙের সঙ্গে কালো কিংবা গাঢ় খয়েরী ধরনের রঙ মিশিয়ে রঙকে কিঞ্চৎ মলিন করে তুলে তার পাশে উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার। একারণেই অনেকে উল্লেখ করেছেন যে 'গুরুদেবের ছবিতে লালের প্রাচুর্য।' তবে নন্দলাল বসু খুব কাছ থেকে বলছেন – "তদুপরি রবীন্দ্রনাথের বর্ণরুচি এমন অভ্রান্ত আর এত পরিশীতিল যে, বরণসংগতিতে তাঁর কোথাও কোনো দুর্বলতা দেখা যায় না" আর এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন 'বিভিন্ন পর্দায় দুটি ঘোরে রঙও তিনি গায়ে গায়ে ব্যবহার করেছেন – গাঢ় নীল রঙের পাশে গাঢ়তর কালিমা। অথচ প্রয়োগনৈপুণ্যের গুণে প্রত্যেকটিতে চিত্ররূপের স্তরবিন্যাসকে স্পষ্ট করে তুলেছে বৈ একশা করেনি।" এবং তিনি মনে করেন বরণের এই উজ্জ্বলতাই ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথের ছবির সাফল্যের অন্যতম কারণ।

ছবি আঁকার অধ্যায় রবীন্দ্রনাথের জীবনগ্রন্থের উপসংহার। তাঁর ছবি ও তাঁর আত্মজীবনী যার একটি অপরটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। আসলে কবির অবচেতন স্তরের কোথাও একটা চিত্রশিল্পী হওয়ার বাসনা লুকিয়ে ছিল। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তাঁর এই বাসনা পূর্ণ হবার পথে কত বিচিত্র সব প্রতিমা কত বিচিত্র রূপে যে তাঁর চিত্রপটে ধরা দিল তা দেখে আমাদের বিস্ময়ের অবধি নেই। শিশু যেমন নতুন খেলনা পেয়ে জাগ্রত এবং নিদ্রিত অবস্থায় তাকে কিছুতেই হাতছাড়া করতে চায় না, কবির ছবি আঁকাও

তেমন একটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। চিত্রশিল্পসত্ত্বা তাঁর বিরাট কর্মকান্ডের একটি ক্ষুদ্র অংশ হলেও, সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে তিনি শুধু প্রথম আধুনিক ভারতীয় চিত্রশিল্পী হয়েই রইলেন না, রইলেন এক বিশিষ্ট অবদানকারী এবং এক বিশিষ্ট শিল্পী সত্তার অধিকারী হয়েও। কবির কথাতেই বলতে পারি ---

"তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে,
নববালক জন্ম নেবে নুতন আলোকেতে।
ভাবনা আর ভাষায় ডোবা, --
মুক্ত চোখে বিশ্ব শোভা
দেখাও তারে, ছুটেছে মন তোমার পথে যেতে।"

(আশীর্বাদ। বিচিত্রিতা)

তথ্যসূত্র:

১। দস্তিদারবর্ণালী ঘোষ, আকার প্রকারের মহাযাত্রায় রবীন্দ্রনাথের ছবি, সৃষ্টির একুশ শতক, উৎসব সংখ্যা ১৪১৯, পৃঃ ১১৬
২। মুখোপাধ্যায় বিনোদবিহারী, চিত্রকথা, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃঃ ৩০৩
৩। 'পথে ও পথের প্রান্তে' বিশ্বভারতী, কলকাতা। জৈষ্ঠ্য ১৪০০, পৃঃ ৫৪
৪। পূর্বোক্ত উৎস, পৃঃ ৪৮
৫। দেবীপ্রসাদ, অনুবাদ মৈত্রেয়ী মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষা এবং চিত্রশিল্প, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ২০১২, পৃঃ ৫৬
৬।মুখোপাধ্যায় বিনোদবিহারী, রবীন্দ্রনাথের ছবি, চিত্রকথা, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৮৪, পৃঃ ২৯৯
৭। Ratan Parimoo: The sources and the Development of Rabindranath's paintings in Rabindranath Tagore – Collection of Essays ed. Ratan parimoo. Lalit Kala Akademi, New Delhi, 1989, P. 28
৮। বন্দোপাধ্যায় সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রচিত্রকলা, রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৮২, পৃঃ ২৭৯
৯। দেবী মৈত্রেয়ী : মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থম কলকাতা ১৩৬৭, পৃঃ ১৩৬
১০। বসু নন্দলাল, গুরুদেবের আঁকা ছবি, বিশ্বভারতী কোয়াটারলি, মে-অক্টোবর ১৯৪১/ দৃষ্টি ও কৃষ্টি, বিশ্বভারতী ১৯৮৫

সহায়ক:

১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, পথে ও পথের প্রান্তে, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ। কলকাতা জ্যৈষ্ঠ ১৪০০
২। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র ১১, বিশ্বভারতী, ১৯৭৪
৩। বসু নন্দলাল, গুরুদেবের আঁকাছবি, দৃষ্টি ও সৃষ্টি, বিশ্বভারতী, ১৯৯৩
৪। মুখোপাধ্যায় বিনোদবিহারী, রবীন্দ্র-চিত্রের ভিত্তি, রবীন্দ্রনাথের ছবি, রবীন্দ্রনাথের ছবি ও সাহিত্য। চিত্রকথা। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৮৪
৫। দেবী মৈত্রেয়ী, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থস, কলকাতা ১৩৬৭
৬। আইয়ুব আবু সয়ীদ, আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, দে'জ, ১৯৭১
৭। বন্দোপাধ্যায় সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র সাহিত্যের পটভূমিকা, দে'জ, কলকাতা ১৯৮২
৮। ডাইসন কেতকী কুশারী ও অধিকারী সুশোভন, রঙের রবীন্দ্রনাথ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৯৭

*****